মুর্শিদে হক্কানী আলহাজ্জ শাহ ছুফী মাওলানা হাবীব আহমদ মরহুমের জীবনালেখ্যের কিছু কথা:-

মকতুবাতে আলফে সানী (রাঃ) এর মকতুবাত শরীফে তিনি তাঁর বিশিষ্ট মুরীদানদের নিকট কোন এলহামী ও কাশ্‌ফী সুসংবাদের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে উক্ত বাণীগুলোর মাধ্যমে আলাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কাশ্‌ফ-এলহামের যোগ্য ব্যক্তিত্ব হাজারে ২/১ জন থাকতে পারেন। তবে আলাহ পাকের দরবারে আমাদের মত নগন্য ব্যক্তির হাজার শোকর এজন্য যে মরহুম পীর সাব কেবলার পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং নেকআমলের সংস্পর্শে এসে আল্‌ফে সানী (রাঃ) এর নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

মরহুম পীর সাব কেবলার সমসাময়িক মুরব্বীগণের নিকট থেকে কানে শোনা তাঁর সোহবতে আসার পর থেকে, বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্বীয় বক্তব্য অনুসারে এবং বিগত প্রায় ২২ বৎসরে তাঁর সাথে চলাফেরা এবং উঠক-বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে পীর ভাইদের অবগতির জন্য কিছু লেখার চেষ্টা করছি। তাঁর সম্পর্কে হয়তো অন্যান্যরা এক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনায় আছেন। তাই হোক, সব লেখার সমন্বয়ে পীর সাব মরহুমের পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত তৈরী হলে সকলেই উপকৃত হবেন আশা করছি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় পীর সাব কেবলার পরহেজগার দ্বীনদার দাদা বিগত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা থেকে এসে চুনতী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর আব্বা শাহ মাওলানা নজীর আহমদ ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ বুযর্গ, আলেমে দ্বীন এবং তথকালীন ভারত বিভাগ পূর্ব উপমহাদেশের অলিকুল শিরোমনী আলহাজ্জ হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (রাঃ) এর (চট্টগ্রামের ৪২/৪৩ জন) খলীফাদের অন্যতম। তাঁর একান্ত মোখলেছ বিশিষ্ট পীর ভাই ছিলেন আরকানের গুদামবাড়া এলাকার শাহ মাওলানা আবদুছ ছালাম আরকাশী (রাঃ) যিনি সুদূর আরকান থেকে অলৌকিক ভাবে চুনতী এসে পীর সাব কেবলার আব্বার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। পীর সাব কেবলার আব্বা মরহুম ১৯৪৪ইং তে ইনতিকাল করেন। এতে বুঝা যায় আরকানী (রাঃ) এর পূর্ব থেকেই চনুতী আসা যাওয়া করতেন এবং তরীকত প্রচারে তাঁর পীর ভাইগণ সহ আজমগড়ী (রাঃ) এর সাথে বিভিন্ন এলাকায় সফর করতেন। ফলে মরহুম পীর সাব কেবলা তদীয় পীর হযরত আরকানী (রাঃ) এর খাছ সোহবত পাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। সুতরাং পীর সাব কেবলা স্বীয় পিতার নিকট থেকে খেলাফত লাভ করার পরিবর্তে আরকানী (রাঃ) এর কাছেই খেলাফত লাভ করেন। তবে খেলাফত লাভের সঠিক সন তারিখ জানা সম্ভব না হলেও ছাত্র জীবন থেকেই তরীকতের জীবন আরম্ভ করেন। বলা যায় এ কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর তাছাউফ জীবন ৬৫ বৎসরের কম নয়। তাঁর আব্বা ছিলেন চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসার হেড মাওলানা। বাকলিয়ায় তাঁর বহু মুরীদ ছিল। পীর সাব কেবলার স্বীয় বক্তব্য অনুসারে তিনি ১৯২২ সালে চুনতী ইউসুফ মনজিলে (শাহসাব কেবলার পুরান বাড়ী) জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুত; এটাই তাঁর নানার বাড়ী এবং প্রথম শশুর বাড়ী। তিনি তৎকালীন পদ্ধতির স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন বলে জানা যায়। পরবর্তী কালে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসায় নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখনকার শিক্ষাবোর্ড ছিল কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা। তিনি এ বোর্ডের অধীনে আলিম ১৯৩৯ইং তে মেধায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ফাজিল ১৯৪১ ইং তে ২য় স্থান এবং ১৯৪৩ ইং সনে মমতাজুল মুহাদ্দেসীন ২য় বিভাগে উর্ত্তীণ হয়। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানা যায়।

তাঁর অধ্যয়ন জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর আব্বা ইনতিকাল করেন। ফলে তৎকালীন মুরব্বীদের অনুরোধে তিনি চুনতী হাফিজিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় মোদরেস হিসাবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ কালে তিনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় ১০/১২ বৎসর এ গুরু দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করেন। ১৯৮২/৮৩ সালের দিকে ইউসুফ মঞ্জিলের শাহ মাওলানা শফিক আহমদ সাবকে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তরীকত চর্চার মাধ্যমে সমাজের ব্যক্তিচরিত্র সংশোধনের তৎপরতা আরম্ভ করেন।

তাঁর সমসাময়িক পীর ভাই বাঁশখালীর শেখের খিলের মাওলানা এলাহী বখশ। বাকলিয়ার মাওলানা মাহমুদুল হক (বড় মাওলানা) নাইক্ষ্যাং ছড়ী এবং খরুলিয়ার ২জন এবং উখিয়ার শাহ বদিয়র রহমান আরকানী (রাঃ) একযোগে আজমগড়ী আরকানী মুজাদ্দেদীয়া কাদেরীয়া তরীকা প্রচার শুরু করেন। ফলে চট্টগ্রামে অনুমানিক দুই তৃতীয়াংশ মুরীদান উক্ত তরীকায় দীক্ষা লাভ করে তরীকত চর্চা করতে থাকেন। তৎপর একজনের ওফাতে অন্য পীর ভাই (খলীফা) দায়িত্ব পালন করে সঠিক তরীকা ঠিকিয়ে রাখেন।তখন আজমগড়ী তরীকার পীর ভাই খলীফাদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব - সম্প্রীতি ও আস্থা বিরাজমান ছিল। একে একে তাঁদের ওফাতের পর নানা কারণে তরীকতের সবক প্রদান এবং যিকরের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন আসার ফলে পুরাতন মুরীদানরা কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়েন। মরহুম পীর সাব কেবলা এ সমস্যা সমাধানে ১ম পদক্ষেপ হিসাবে উত্তর চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামে বৎসরে কমপক্ষে ২ বার সফর করে এলাকার মুরীদান নিয়ে যিকর মাহফিল এবং সবক আদান প্রদানের ব্যবস্থা নেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে চুনতী বড় মাওলানা বাড়ীর আলহাজ্ব মাওলানা সাইফুদ্দীন সিদ্দীকি, মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকি, মাওলানা শাহরিয়ার, মাওলানা মোজহের আহমদ এবং মাওলানা মুহাম্মদ কাছেম প্রমুখ মুরব্বীদের পরামর্শে বিগত প্রায় ২২ বৎসর থেকে বার্ষিক ইখ্ওয়ান সম্মেলন চালু করে শরীআত ভিত্তিক মুজাদ্দেদীয়া নক্শবন্দীয়া তরীকতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মুরীদানদের সাধ্যমত চাঁদা সংগ্রহ এবং আগ্রহী ভক্তদের অনুদানে এ সম্মেলনের ব্যয়ভার মেঠানো হয়ে আসছিল। এসম্মেলনের সিংহভাগ অনুদান পীর সাব কেবলার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত আধুনগর লোহাগাড়ার সুপরিচিত দানশীল ব্যক্তি ঢাকাস্থ "নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাঃ" এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব আলহাজ্জ নুরুল ইসলাম সাব দিয়ে আসছেন। এ সম্মেলন প্রাথমিক পর্যায়ে পীর সাব কেবলার মসজিদে হতো। পরে বায়তুলাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়। মেহমানদের আপ্যায়ন সীরাত ভান্ডারে সম্পন্ন হয়।

তৃতীয় পদক্ষেপ হিসাবে রীতিমত সবক আদান প্রদান, নতুন দাখেলা এবং তাছাউফ সম্পর্কে তাযকেরাতুল আউলিয়ার মাধ্যমে মুরীদানদের আগ্রহ সৃষ্ঠির জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । এ বৈঠক বেশ কয়েক বৎসর বায়তুলাহ মসজিদে চলে, পীর সাব কেবলার বার্ধক্য এবং দুর্বলতার কারণে মুরব্বী মরহুম মাওলানা শাহবেয়ার সাবের প্রস্তাবক্রমে নিকটতর স্থান চুনতী জামে মসজিদে স্থানান্তরিত হয়। বিগত কয়েক বৎসর থেকে বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার কষ্ঠ লাগব হওয়ার জন্য তারই অনুমতিক্রমে স্বীয় পারিবারিক মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

৪র্থ এবং ওফাতকাল পূর্ব পর্যন্ত সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি যাঁদেরকে দায়িত্ব পালনের উপযুগী মনে করেছেন তাঁদেরকে স্ব স্ব এলাকায় তাঁর পক্ষ থেকে সবক আদান প্রদান করার এজাযত দেন। আলাহ মালুম কার দ্বারা কি কাজ হয়। তবে ইনশালাহ, হতাশার কোন কারণ নাই।

মরহুম পীর সাব কেবলার একবোন ডঃ আবু বকর রফিক সাবদের আম্মা এবং তাঁর ছোট ভাই মৌলভী আনিস আহমদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ছাত্র জীবনে ইনতিকাল করেন। মরহুম পীর সাব কেবলা কর্মজীবনে মাদ্রাসার শিক্ষকতার পর নানা প্রতিষ্ঠানের গর্ভনিং বডিতে সভাপতি এবং

সহ-সভাপতি হিসাবে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তন্মধ্যে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী, হাকিমিয়া এতিম খানার সভাপতি, চুনতী মহিলা মাদ্রাসার সহ-সভাপতি । বহুবৎসর তিনি চুনতী জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি ওফাতকাল পর্যন্ত আধুনগর ইসলামিয়া মাদ্রাসার সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত আজমগড়ী (রাঃ) এবং আরকানী (রাঃ) জীবিত কালেই তাঁকে সাতকানিয়া খানকাহের মুতাওয়ালী নিযুক্ত করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে খানকাহ কমিটির সদস্যপদের অন্তর্ভক্ত ছিলেন। খানকাহের বর্তমান সেক্রেটারী আলহাজ্জ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্যক অবগত আছেন। তিনি পীরসাব কেবলার অন্তরঙ্গ ছিলেন।

মরহুম পীর সাব কেবলা ওফাতকালে পূর্বাপর সংসারে মোট ৬ মেয়ে ও ৪ ছেলে রেখে যান। মেয়েদের মধ্যে (১) নুরুন, ছদাহা, (২) সাকু, চুনতী, আঃ ডঃ আবু বকর রফিক, (৩) খায়রুন নিছা, বড়হাতিয়া (আঃ নুঃ ইসলাম সাবের ভাগিনা) (৪) রুকু, চুনতী, আঃ মাওলানা মাইজুদ্দীন সিদ্দীকি বড় মাওলানা বাড়ী, (৫) পুতী, আঃ ডাঃ কাইয়ুম মলিক সোবহান, (৬) খদীজা, বড় মিয়াজী পাড়া এবং বড় ছেলে মাওলানা মাহবুব, ২য় মাওলানা শহীদু (২জন বিবাহিত) ৩য় মাষ্টার অহিদু এবং ৪র্থ হাফেজ মাওলানা (ছাত্র) ছালাহুদ্দীনকে রেখে যান।

মরহুম পীর সাব কেবলা হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে দু'বার সৌদি আরব সফর করেন। স্বীয় বক্তব্য অনুসারে একবার নিজের জন্য এবং দ্বিতীয় বার তাঁর আম্মার জন্য তিনি শেখুত্ তরীকত আজমগড়ী (রাঃ) এবং শাহ সৈয়দ আবদুল বারী (রাঃ) এর মাজার জিয়ারতে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকাও পরিদর্শন করেন বলে জানা যায়।

আজকের মুসলিম সমাজে গদীনশীন ভণ্ড পীরের আস্তানা খানকাহের অপসংস্কৃতির প্রসার প্রত্যক্ষ করে তিনি হক্কানী তরীকতপন্থী পীর হিসাবে শিরক বিদআত সম্পর্কে সর্বত্রই প্রতিবাদ করে আসছিলেন। তিনি ওফাতের প্রায় ৬মাস পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত, মধ্যম মতবাদের, দৈনিক পত্রিকা এবং মাসিক ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়তেন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভালটা স্বীকার করতেন এবং মন্দটার সংশোধনী মত পোষণ করতেন। দুনিয়াদার আলেমদের তিনি সমালোচনা করতেন। তিনি প্রকৃত হককামী আলেম ওলমা ও পীর মশায়েখদেরকে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানাতেন। মুসলিম উম্মার বর্তমান নাজেহাল ও দূরবস্থার জন্য তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন ছিলেন।

সর্বশেষ ২৫/১১/০৬ রোজ শনিবার বাদে মাগরিব তাঁর জামাতা ডাঃ কাইয়ুম সাবের পরামর্শে তাঁকে লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতভর সম্ভাব্য চিকিৎসা চলে। সাথে তাঁর সাহেবযাদা শহীদু এবং তাঁর এক কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীগণ জানান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি স্বজ্ঞানে ফিরে নিজেও কলেমা তামজীদ পড়েন এবং সকলকে ও উচ্চস্বরে পড়তে বলেন এবং চক্ষুদয় একটু এদিক সেদিক করে সাধারণ দু'এক হিচ্‌কীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিলাহ ওয়াইন্না ইলাইহিরাজেউন। কিছুক্ষন পূর্বে তাঁর সাহেবযাদীর নিকট "ভাত" ও চেয়েছেন বলা হয়। তখন ছিল রবিবার ভোর ৬-১০মি। সংগে সংগে মোবাইল যোগে যে যাকে পারে তাঁর ওফাত সংবাদ প্রচার করে দেয়।

লেখক অধম সেই রাত শনিবার দিবাগতরাত স্বীয় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে (পূর্বদিন জুমাবাদ বাড়ী থেকে শহরে গিয়ে) চন্দনপুরা রাত যাপন করি, ফজর নামায পর সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষনিক নিজের কাছে রক্ষিত মোবাইল ইনডেকস খুলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও বাঁশখালীর বিভিন্ন এলাকার মুরীদানদের নিকট যোগাযোগ শেষ করে বাড়ীর পথে যাত্রা দেই। সকাল ১২টায় পৌঁছে বাড়ীতে বিলম্ব না করে মরহুম পীর সাব কেবলাকে দেখতে যাই এবং ইতিপূর্বে অধমের দেখা ২১/৯/০৬ইং স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি। অর্থ্যাৎ ২ মাস কয়েকদিন পর মরহুম পীর সাব কেবলার ওফাতের দৃশ্য বাস্তবায়িত হয়। আলাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন, আমীন। স্বপ্নের কথা বড় মাওলানা বাড়ীর মুরব্বী

জনাব আলহাজ্ব মাওলানা সাইফুদ্দীন সিদ্দীকি যিনি মরহুম শাহ হাকীম মাওলানা মুনীর আহমদ (রাঃ) এর অন্যতম খলীফা কে যখন জানাই তখন তিনি ও মন্তব্য করেন। ‘‘অপেক্ষায় থাক, তাঁর শারিরীক অবস্থা দৃষ্ঠে তাই মনে হচ্ছে”। এর প্রেক্ষিতে ১৪ই রমজান ২৩/১০/০৬ইং তারিখে উভয়ে রোগশয্যায় শায়িত পীর সাব কেবলাকে দেখতে যাই। উভয়ের সাথে খোলা মনে পত্রে লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শেষ কথা বললেন।

এমনিতেই রমজানের পূর্ব থেকে তাঁর আলাপ আচরণে ওফাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাংসারিক কথাবর্তা প্রায়ই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া নীরব থাকতেন। স্বল্প পরিমাণ খাওয়া দাওয়াতে ও অনিচ্ছা। দুর্বলতা চরমে পৌঁছার পরও নতুন দালানের পশ্চিম কক্ষে নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। রমজানের ১০/১২ দিন পূর্বে তাঁকে শহরে নেওয়া হয় যথাসাধ্য সুচিকিৎসার জন্য। রমজানের রোজা রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাই একটু শারিরীক শক্তি ফিরিয়ে আনা যায় কিনা তাই। ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে রমজানের ৩/৪ দিন পূর্বে বাড়ীতে ফিরে আসেন। ২৩/৯/০৬ইং শনিবার তাঁর পারিবারিক মসজিদে তাঁরই ইমামতিতে এবং মুনাজাতে আমাদের সাথে একখতম কুরআন তেলাওত হয়। ২৫/৯/০৬ইং পহেলা রমজান। পীর সাব কেবলা রোযাদার। সপ্তাহ খানেক পূর্বে সাহেবযাদা মাওলানা মাহবুর হৃদরোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারত সফরে যান। তাঁরই শেফার জন্য পুনঃএক দাওয়াতের নির্দেশ পাই। সেদিনই তিনি জ্বরাক্রান্ত হন। তাই তিনি মসজিদে মুনাজাতে শরীক হতে পারলেন না। বললেন, “তোমরাই কাজ সেরে নাও”। চিকিৎসা শেষে রমজানের শেষের দিকে মাহবুব ভাই দেশের বাড়ীতে ফিরেন। রমজানের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে একদিন রিকশাযোগে শেষ বারের মত হুজুর কেবলা মুন্সেফ বাজার যান। সম্ভবতঃ কিছু যাকাতের টাকা বিলি করার উদ্দেশ্যে ছিল। অধমকে কাছে ডেকে কয়েক হাজার টাকা নিদিষ্ট লোকের নাম ইশারা করে বিলির জন্য গোপন হাতে গুজিয়ে দিয়ে যান। আমি যথাযথভাবে বিলি করে দেই। কয়েকদিন পর লোহাগাড়া ইসলাম ব্রীক কোং আমাকেসহ পীর সাব কেবলার বাড়ীতে গেলেন এবং চট্টগ্রাম শহরের বরশবিল্ডিং বিক্রীর টাকা ওয়ারিশ গণের নামে ব্যাংক ড্রাফট তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। শয্যা শায়িত অবস্থায় ও ঈদুল ফিতর এর পূর্ব পর্যন্ত যাকাত ফিৎরা, অন্যান্য সাহায্য অর্থ নিজ হস্তে এবং পরিবারের মাধ্যমে বিতরণ করেন। আমরা কয়েকজন রীতিমত সাপ্তাহিক বৃহস্পতিবার বৈঠকে মসজিদে হাজির হয়ে আসছি। রমজানের শেষ প্রান্তে আলবিদাসহ তিনি জুমা এবং পরবর্তীতে আর জুমা মসজিদে যেতে পারলেন না। জানা যায় ঈদের নামাযের আগ্রহ থাকা সত্বে যাওয়া হলো না। বেশ কয়েকমাস (সুস্থ অথচ ক্ষীনকায় অবস্থায়) পূর্ব থেকে মাথার চুল কাটা বন্ধ করে দেন। ভাই-নাতি সম্পর্কের কেউ চুল কাটতে অনুরোধ করলে বলতেন, এ চুল নিয়েই ঐ কুলে যেতে চাই। ওফাত কালের কাছা কাছি কয়েবার বলতে শোনা যায় “যাওয়ার খবর আসে মনে হয়। কিন্তু কেন রয়ে গেলাম, জানিনা”।

পীর সাব কেবলার নাজুক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমরা যারা একটু সর্বদা ধারে কাছে থাকতে সচেষ্ট ছিলাম, নৈরাশ এবং উদ্বিগ্ন হতে চলছিলাম, কারণ ডাক্তারী ব্যবস্থাপনাও প্রায়ই অকার্যকর হয়ে আসছিল এবং খাওয়া দাওয়ায় ও তাঁর অনাগ্রহ। দূরান্তরে তাঁর মুরীদানদের কেন্দ্রে মোবাইল করে খবর দিলাম। দলে দলে জীবদ্দশায় তাঁকে দেখার জন্য লোকজন আসতে থাকে।

ঈদের পূর্বে রক্তহীনতা চরমে পৌঁছাতে গিয়ে তাঁকে পুনরায় শহরে নেওয়া হয় এবং ২৩/১০/০৬ইং সোমবার, যেদিন শাহযাদা জামাল মামার স্ত্রী নুছরাতের মাকে কানাডা থেকে (ক্যান্সার আক্রান্ত ওফাত) চুনতী এনে সীরাত ময়দানে জানাযা সম্পন্ন হয় সেদিন হুজুর কেবলাকে বাড়ীতে আনা হয়। কিঞ্চিত পরিমাণ সুস্থতা পরিলক্ষিত হলেও, অল্প ক’দিন। সে যাক, ২৫/১০/০৬ইং বুধবার সারাদেশে

ঈদ উদযাপিত হয়। বাদে আছর ঈদ সেলামীর জন্য গেলাম। ছালাম দিলাম, শায়িত অবস্থায় একটু চোখ খুলে বাম হাতে ইশারায় আমাদের বসতে বললেন মনে হলো। ঘুমের ব্যাঘাত হবে মনে করে ফিরে এলাম। দুপরে রাজাখালীর পীর ভাই খলীল ফকীর ও কয়েকজন সাথী নিয়ে হুজুরকে দেখতে আসেন।

২৬/১০/০৬ইং বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় আধুনগর নিবাসী, ঢাকাস্থ নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রির এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম সাব তাঁর বাড়ীতে ঈদ সেলামী উপলক্ষে আসেন। দুর্বলতা সত্বে পীর সাব কেবলা তাঁর পাশে বসে প্রায় আধঘন্টা আন্তরিভাবে কথা বলেন। হাজী সাব কিছু নসীহত শুনতে অনুরোধ করলে বলেন, সময় হয়েছে মনে করি, তবুও কেন? জানা যায় হাজী সাব হুজুর কেবলার প্রতি ভক্তি ও হুস্‌নে আকিদতের পরাকাষ্টা স্বরূপ তাঁর পারিবারিক মসজিদ এবং বর্তমান বসতির নতুন দালানটি বছর দু'এক পূর্বে করে দেন। এছাড়া ও হাজী সাব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদীতে অনুদান এবং দারিদ্র বিমোচনে দুঃস্থ ও আর্তদের, তাঁর পবিত্র হাতের মাধ্যমে, আর্থিক লেনদেন করতেন। তাঁরই সুপারিশে বিস্তর বেকার লোক হাজী সাবের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানাদীতে চাকুরী লাভ করে আসছিল।

তা যাক, হাজী সাব হুজুরকে চিকিৎসা ব্যয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাত মিঠানোর জন্য কিছু নগদ হাদীয়া দিলেন মনে হলো। হুজুর তা কৃতজ্ঞতার সাথে নিজ মাথায় বুলিয়ে দুয়া করলেন। অতপর শেষ বারের মত তিনি বিদায়ী সালাম জানিয়ে প্রস্থান করলেন। এর একমাস পর ২৬/১১/০৬ইং রোববার হুজুরের ওফাত হয়।

সম্ভবত ৭/১১/০৬ইং তারিখ পীর সাব কেবলা ২য় ছেলে শহীদুকে নিয়ে সি.এন.জি. তে আমিরাবাদ গিয়েছিলেন। সরাসরি কাপড়ের দোকানদার মাওলানা ফজল সাবের কাছে গিয়ে কি একটা জিনিসের চাহিদা তলব করলেন। অস্পষ্ঠভাবে বলেছিলেন। ৯/১১/০৬ইং তারিখ আমি পেনশনের জন্য সেখানে গিয়ে মাওলানা ফজলের মুখে তা শুনে কেবল আশ্চার্য্যান্বিত নহে বরং শুকরিয়া জানাই যে, এমন নাজুক শরীর নিয়ে কি করে সেখানে গেলেন। শুকরিয়া এ জন্য যে, হুজুর একটু সুস্থতা বোধ করছেন। পরে জানতে পারলাম ফজল সাবের কাছে একটি পিতলী ষ্ট্যান্ডের বাতিদানির ফরমায়েশ দিয়েছিলেন। আমিরাবাদ তা মেলেনি বলে সে চাহিদা পূরণ না হওয়াতে নাকি একটু অসন্তোষভাব প্রকাশ করেছিলেন।

১৯/১১/০৬ইং রবিবার অসুস্থ হুজুরকে দেখার জন্য সুদূর গর্জনীয়া থেকে ৬/৭ জনের একদল পীরভাই দুপুরে পৌঁছেন। আমি সহ যুহরের আগে হুজুরের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর কক্ষে প্রবেশ করি তাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এক নজর সকলের পানে চোখ বুলিয়ে সালাম দিলেন, মোসাফেহা করলেন, গর্জনীয়া ফয়জুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সাবের , ৮০ উর্দ্ধ বয়স, নিতান্ত দুর্বল। তিনি হুজুরের শয্যা পাশে বসে কান্নায় ফেটে পড়েন।

ভাই শহীদু মেহমানদের বাদে যুহর খাওয়ার অনুরোধ করলেন। যুহরের নামায শেষে বাহিরে এসে দেখি কৃশকায় পীর সাব কেবলা পাকা ঘাটের দেওয়ালে গোসলের জন্য অপেক্ষায় আছেন। একজন মেহমান ধরে রাখলেন। আমাকে ইশারায় মেহমানদেরকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ভাই শহীদু গরম পানি এনে গোসল করিয়ে দিলেন বলে জানায়। মেহমানদের খাওয়া শেষে তাদের পক্ষ থেকে চাচীমার কাছে বিদায়ী সালাম জানিয়ে মেহমানরা বিদায় নিলেন। সম্ভবতঃ এ গোসলই হুজুরের জন্য পুকুরের ঘাটের শেষ গোসল।

২১/১১/০৬ইং মঙ্গলবার, জানতে পারলাম দুপুর থেকে হুজুরের অবস্থা নাজুকতর কিছু গিল্‌তে পারছেন না। পশ্চিম কক্ষে নামাযের জন্য যেতে অক্ষম, বিছানাতেই বসে নামায আদায় করছেন। জামে মসজিদের খতীব ভাই মাওলানা হাফিজুল হককে নিয়ে বাদে মাগরিব তাঁর অবস্থা জানতে গেলাম। অন্যান্য সময়ের মত চোখ বুজিয়ে আছেন। পাশে বসে সালাম দেওয়াতে একটু দেখেন আর প্রস্রাবের

শেকায়ত করলেন। একটু শান্তনা দিলাম আপনি মাজুর একই অজুতে এক নামায পড়বেন। পিপাসার্ত হলে পানি খাবেন। চাচীমা বললেন, প্রস্রাবের কারণে পানি খেতে চাননা। হাফিজ ভাই জিজ্ঞাসা করতে পানির কথা বললেন। তিনি বিছানায় উঠে তুলিয়ে বসালেন আর আমি পানির গ্লাস তুলে ধরলাম, নিজ হাতে পান করলেন। সালাম জানিয়ে বিদায় হই। চাচীমাকে জিজ্ঞাসা করি রাত্রে পাশে থাকার জন্য লোক লাগবে কিনা? তিনি জানায় তিনি স্বজ্ঞানে আছেন, কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকেন। জিজ্ঞাসা করি পশ্চিম কক্ষ পরিচ্ছন্ন আছে কিনা। বলেন, ঠিক আছে। সকলে যেন সজাগ আছেন এবং শেষ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আছেন মনে হলো ২৩/১১/০৬ইং বৃহস্পতিবার যথারীতি সাপ্তাহিক বৈঠকে হাজির হই। পীর ভাই ও কয়েকজন ছিল। বাদে এশা বাড়ীতে ফেরার পথে জানালা দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় হুজুরকে এক নজর দেখে আমি জীবন্ত অবস্থায় আমার এই শেষ দেখার সৌভাগ্য। ইতিপূর্বে উলেখিত, পরদিন বাদে জুমা আমি পূর্ব নির্ধারিত তারিখ শনিবার ২৫/১১/০৬ইং স্বীয় চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক শহরে যাই। ঐ একদিনের জন্য কেন অপেক্ষা করলাম না। উহ্ ! মনকে প্রবোধ দিতে পারছিনা। মাওলার কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতীত উপায় নাই। মনে মনে আশা পোষণ করতাম। অন্তিমকালে কাছে থাকব। নিজ হাতে গোসল দেবো।

পীর সাব কেবলার ইনতিকালের দিনই বাদে জমাতে আছর ঐতিহাসিক সীরাত ময়দানে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় নামায পড়ান হুজুরের ভাগিনা এবং জামাতা চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রো-ভি.সি. জনাব মাওলানা ডঃ আবু বকর রফিক। পীর সাব কেবলার ওফাতের খবর মোবাইলের মাধ্যমে এবং টি.ভি. নিউজে তড়িৎগতিতে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে চট্টগ্রাম উত্তর দক্ষিণের, পার্বত্য জেলা সমূহের এবং কক্সবাজার বাঁশখালী থেকে অগনিত ভক্ত ও মুরীদান, সমসাময়িক ওলামা কেরাম ও পীর মাশায়েখগন সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর সাব কেবলাকে এক নজর দেখার জন্য তাঁর বসতবাড়ীতে এবং সীরাত ময়দানে জমায়েত হতে শুরু করে। রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকগণসহ হুজুরকে হারানোর বেদনায় আবাল বৃদ্ধ বণিতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ধারণাতীত এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আছর নামাযের পূর্বে মূহূর্তের মধ্যেই বিশাল সীরাত ময়দান লোকারন্য হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী জানাযায় অংশ গ্রহণকারীগণ এ দৃশ্য অবশ্যই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যানবাহন ও যাতায়াত অসুবিধার কারণে শত শত মুরীদান ও অনুরক্ত লোক জানা যায় শরীক হতে পারেন নাই। ফলে নামাযের পরই পালাক্রমে হুজুর কেবলার চেহারা মোবারক দেখানো হয়।

পরে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থন চুনতী শাহী জামে মসজিদের উত্তর পাশ্বস্থ বাউন্ডারী ওয়াল দেওয়া পাহাড়ের মাজারে তাঁর আব্বা শাহ মাওলানা নজীর আহমদ (রাঃ) এর পশ্চিম প্রান্তে সমাহিত করা হয়। এখানেই আরো কয়েকজন আজমগড়ী (রাঃ) এর বিশিষ্ট খলীফাবৃন্দ শায়িত আছেন। উলেখ্য, বিগত ২০০২ সালে তাঁরই নির্দেশে আনুমানিক ২৭ হাজার টাকা খরচে মাজারের ছাউনীটা নির্মিত হয়। উদ্দেশ্য, বৃষ্টি বাদলে এবং গরমের দিনে যিয়ারত কারীদের যেন কষ্ট না হয় আলাহ পাক তাঁর সদিচ্ছা জীবিত কালে পূরণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ। তদুপরি তিনি স্বীয় কবরের স্থানও ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন। উক্ত মাজারের নীচে এবং আশে পাশেও তরীকতের কয়েকজন খলীফা এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণ সমাহিত আছেন।

মাগরিব পূর্বে দাফনকার্য সুসম্পন্ন হয়। বাদে মাগরিব পীর সাব কেবলার বাড়ীর আঙ্গিনায় আগত আত্মীয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ফাতেহা শরীফ অনুষ্ঠানের দিন,তারিখ নির্ধারণ এবং মেজবাণীর অনুমানিক ব্যয় বরাদ্দের এক আলোচনা বৈঠক হয়। পরবর্তী জুমার দিন দুপুরে জেয়াফতের সময় নির্ধারণ এবং পাঁচলাখ টাকার ব্যয় বরাদ্দের অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জেয়াফতের আয়োজন এবং পরিবেশন সীরাত ভান্ডারে হওয়ার সিদ্ধান্ত ও হয়। তদানুসারে ১/১২/০৬ইং

মরহুমের ঈছালে ছওয়াব উপলক্ষে সীরাত ভান্ডারে জেয়াফতের আয়োজন হয়। স্থানীয় ও বহিরাগত অনুমানিক ৩০ হাজার মেহমান অংশগ্রহণ করে।

অন্য দিকে দাফনের দিন বাদে মাগরিব থেকে দুরাত দেড়দিন যাবৎ আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক আউয়াল সাব আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল হাই নিজামী এবং বর্তমান আউয়াল সাব জনাব হাফেজ মাওলানা শাহে আলম সাব উভয়ের উপস্থিতিতে দলে দলে এবং পালাক্রমে হুফ্‌ফাজে কেরাম এবং মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ, পুরাতন-নতুন, মাজারের পাশে বসে পবিত্র কুরআন তেলাওতের ব্যবস্থা হয়। জানা যায়, তাঁরা সকলে মিলে ২৮ খতম আদায় করেন। পরবর্তীতে আরও ২/৩ বৈঠকে ২২/১২/০৬ইং সাবেক আউয়াল সাব নেজামী স্বীয় তত্ত্বাবধানে আর ও ১২ খতম তেলাওয়াত সহ মোট ৪০ খতম সম্পন্ন করেন বলে জানা যায়। কোন হাদীয়া কিংবা পারিশ্রমিকের লেনদেন হয় নাই। হুজুরের প্রতি কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা থাকলে এরূপ নিঃস্বার্থ কাজ করা যায় সহজেই অনুমেয়।

এতদব্যতীত বহিরাগত এবং স্থানীয় যিয়ারত কারীদের সমাগম রাতদিন সমানভাবেই বেশ কয়েকদিন চলতে থাকে। চুনতী গ্রামে যেখানে ফোরকানিয়া এতিমখানা এবং হেফজখানা আছে প্রায় সবগুলিতে খত্‌মে কুরআন তাহলীল স্বতঃ স্ফুর্তভাবে আদায় করা হয়। বস্তুত তরীকতপন্থী ভাইগণকে বাদ মাগরিব ফতিহা শরীফের মুনাজাতে মরহুম পীর সাব কেবলার নাম সংযোজন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক এবং প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। আদী থেকে নবীরাসূলগণের সাহাবা কেরামদের এবং আউলিয়া কেরামদের সমালোচক ছিল, আছে এবং থাকবে। সমালোচনার উর্দ্ধে কেউ নাই।

তিনি আজমগড়ী তরীকতের উজ্জ্বল নক্ষত্র শাহ মাওলানা আবদুচ্ছালাম আরকানী (রাঃ) এর বিশিষ্ট সর্বশেষ খলীফা ছিলেন। যেহেতু নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জমাআতের মতবাদের উপর ভিত্তিশীল, তাই তিনি মুজাদ্দেদীয়া তরীকাই প্রচার করতেন, যদি ও তিনি কাদেরীয়া চিশতীয়ার ও এজাযত হাসিল করেছিলেন এবং মূজাদ্দেদীয়ার সবক শেষে কতিপয়কে কাদেরীয়া চিশতীয়ায় ও দীক্ষা দেন।

তাঁর প্রচার ক্ষেত্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা যেমনঃ কক্সবাজার সদর রামু গর্জানীয়া, নাইক্ষ্যংছড়ী খরুলিয়া, পানির ছড়া, ধলীর ছড়া হারবাং, বাঁশখালী, পুঁইছড়ী, রাজাখালী, মহেশখালী এবং কুতুবদিয়ার পুরুষ মহিলা। উত্তর চট্টগ্রামে রাঙ্গুনীয়া, বোয়ালখালী বাকলিয়া এবং চন্দনাইশ এলাকার পুরুষ-মহিলা মুরীদান অসংখ্য।

বিগত ২ বৎসর পূর্ব থেকে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে বাহিরের সফর প্রায়ই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্থানীয় এযাজত প্রাপ্তদের দায়িত্ব আদায়ের নির্দেশ দেন। তাঁর জানাযায় উলিখিত এলাকার ভক্ত অনুরক্ত এবং নিয়মিত সবক গ্রহণকারী প্রায়ই মুরীদান যোগদান করতে দেখা যায়। এমনকি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বেশ কয়েকজন ৮০ উর্দ্ধ বয়সের মুরীদানকে ও দেখা যায়।

রমজানের ১০/১২ দিন পূর্বে চট্টগ্রামে ডাঃ এর পরামর্শে চিকিৎসা করানোর জন্য তাঁকে শহওে নেয়া হয়। রমজানের ৩/4 দিন পূর্বেই বাড়ীতে আসেন। ২৫/০৯/০৬ইং সোমবার ১লা রমজান রোজা রেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন, রোগ এবং বার্ধক্য ক্রমে বাড়তে থাকে। ৮/১০/০৬ইং রোববার ১৪ রমজান স্থানীয় মুরব্বী জনাব মাওলানা সাইফুদ্দীন ছিদ্দীকিকে তরীকত সম্পর্কে শেষ বক্তব্য শোনান এবং নিজের শেষ অবস্থার ইঙ্গিত দেন। ২৫/১০/০৬ইং থেকে পারিবারিক মসজিদের পরিবর্তে বাড়ীতে নামায আদায় করতে থাকেন, ২৬/১১/০৬ইং ওফাত। কেবল দূরান্ত্ম এলাকায় নয় বরং সাতকানিয়া লোহাগাড়ার ও সহস্রাধিক পুরুষ মহিলা মুরীদান আছে। অসংখ্য ভক্তবৃন্দ।

তিনি নিজ দায়িত্ব বোধের তাড়নায় সঠিক তরীকার প্রচার প্রসার এবং সংরক্ষণের জন্য বিগত ২২ বৎসর যাবৎ বার্ষিক ইখ্ওয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়ে আসছিলেন। শরীআত ভিত্তিক তরীকাত প্রচারই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাউফ চর্চাকারী ওলামায়ে কেরামদের তিনি বেশী পছন্দ করতেন, তাই সম্মেলনে আত্মশুদ্ধীয় বিষয় বস্তুর উপর বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর পছন্দমত বক্তাদের তিনি দাওয়াত করতে পরামর্শ দিতেন। প্রতি বৎসর যারা এ সম্মেলনে যোগদান করে আসছেন তাঁরাই একমাত্র এর গুরুত্ব উপলদ্ধী করতে পেরেছেন। তাঁর অবর্তমানে ও এ সম্মেলন জারী রাখার ইঙ্গিত দিয়ে যান।

তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি স্বীয় তালীম অনুসারে আজমগড়ী তরীকা চালু থাকার জন্য স্থানীয় ও বাইরের বিশেষ ছয় ব্যক্তিকে বিগত ১৯৯৮ এবং ২০০৪ইং বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে এজাযত প্রদানের ঘোষণা দেন বলে জানা যায় এবং মরহুম পীর সাব কেবলার নূতন পুরাতন শাগরেদ ও মুরীদানদের নিকট তাঁরা পরিচিত হয়েছেন বলে ও জানা যায়।

তাঁর উদার মনোবৃত্তির কথা সর্বজনবিধিত, ধনী গরীব সকলের দাওয়াত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতেন। নিজ পকেটের অর্থ দিয়ে আপ্যায়ন করাতেন। কোন কারণে পকেট খালী থাকলে,ধার করে মেহমানদারী করাতেন। পোকামাকড় কীট পতঙ্গ ও তাঁর নিকট থেকে আপ্যায়ন পেত বলে জানা যায়। বহু দৃষ্টান্ত তাঁর মুরীদানদের জানা আছে বলা হয়।

তিনি নিজেকে প্রচার করতে পছন্দ করতেন না ।"পীরে কামেল" খেতাব শুনলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। সঠিক তরীকায় সুলুকের সবক চর্চা না করে এমন গদীনশীন পীরের উপর তাঁর আস্থা ছিল না। রিয়াবত মোজাহেদা ও মোরকাবা ব্যতীত ব্যাপক হারে এজাযত বা খেলাফত প্রদান তাঁর নিকট অবাঞ্চিত ছিল।

তিনি তাঁর মুরীদানদের নিকট তাঁর কয়েকটি স্বপ্নের কথা পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করতেন। যাতে মুজাদ্দেদীয়া নকশবন্দীয়া তরীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ তরীকা বলে প্রমানিত। যার পরিপূর্নতার জন্য ইমাম মেহেদী (আঃ) এর আগমন সন্নিকট বলে মন্তব্য করতেন। তাঁর মতে আজমগড়ী তরীকা ব্যতিত অন্যান্য প্রচলিত তরীকায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। তিনি মন্তব্য করতেন যারা এ কাজে লিপ্ত তাঁরা অবশ্যই পরকালে জবাবদিহি হবেন।

ওফাতের মাস দেড়েক পূর্বে সর্বশেষ বক্তব্য জানা যায় যে, যাঁরা এ তরীকায় আমল করবেন তাঁরা অবশ্যই ফায়েদা পাবেন যদি ও তাঁরা সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু তাঁদের ফজীলত বেশী। কোন এক সময় তিনি নবী কারীম (সঃ) এর লাশ মোবারক কাঁধে নিয়ে চলছেন বলে স্বপ্নে দেখেন এবং পরবর্তী বেশ কিছুদিন তাঁর স্কন্ধ ভারী ভারী মনে হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন। এতে তিনি সঠিক তরীকা প্রচার ও সংরক্ষণের দায়িত্বভার তার উপর বর্তিত বলে ও মন্তব্য করেন।

তাঁর সরল জীবন যাপনের জন্য দলমত নিবিশেষে সকলেই তাঁকে সম্মান সমাদর করতেন। শিশুর মত বাক্যালাপ। মিষ্টভাষায় মত বিনিময় তারই প্রমাণ। তরীকতের কর্মসূচী নিয়ে যে সব এলাকায় সফর করতেন সর্বত্রই তিনি যেন সকলের সম্মানিত একজন পরিবার সদস্য। যেখানে জায়গা পেতেন শুয়ে পড়তেন। ঝাঁকজমক অনুষ্ঠান কিংবা ব্যয়বহুল খাদ্য পরিবেশন পছন্দ করতেন না। মহিলা মুরীদানদের তরীকত চর্চায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করতেন। তাদের উৎসাহিত করতেন। অন্যলোকের সাংসারিক কাজ কর্মে কিংবা এবাদত বন্দেগীতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে যিকিরে জলীর মাহফিল তিনি পছন্দ করতেন না। যেহেতু নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকায় উক্ত যিকির বেদাত। তাই যে কোন তরীকার যিকরে জলী নির্বিঘ্নে) বাদে তাহাজ্জুদই উপযুক্ত সময়, যদি যিকরকারী একই তরীকাভুক্ত হয়, পীর মুর্শিদের তালীম ও পদ্ধতি অনুসারে হলেই ফলপ্রসু অধিক হয়। এ তরীকায় যিকরে খফীই অধিক গুত্বপূর্ণ।

তিনি তাঁর মুরীদানদের যে যে তরীকার তাকে সে তরীকার যিকর পদ্ধতি তালীম দিতেন বলে জানা যায়। সভা সমিতির সভাপতিত্বের দায়িত্বে কোথায়ও আমন্ত্রিত হলে বেশীক্ষণ থাকতেন না। যে

কোন ক্রমে বাড়ীতে মাগরিব পূর্বে পৌঁছতে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি মনে করতেন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের স্বীয় তরীকার অজিফা মোরাকাবা যথাযথ আদায় না হলে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। সগৌরবে ঝাঁকজমক জুলুস, নানা খেতাবে সম্ভোধন এবং মুরীদানের কদমবুচি পছন্দ করতেন না। স্বীয় সিলসিলার তসবীহ অজায়েফ যথাযথভাবে আদায় করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তরীকতের নির্ধারিত অজীফায় বাদে যুহর কুরআন তেলাওতকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। সকাল ১১টা থেকে যুহর নামায শেষ নাগাদ তাঁকে তাঁর পারিবারিক মসজিদে প্রায়ই নফল নামায ও কুরআন তেলাওতে মশগুল থাকতে দেখা যেত। তিনি হযরত আরকানী (রাঃ) এর অভ্যাস ও নির্দেশ মোতাবেক বাদে জুমা মুরীদানদের নিয়ে তেলাওত পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

মরহুম হুজুর কেবলার তাছাউফ জীবনের সাথে অধমের সম্পৃক্ততার অছিলাঃ-

বাদ হামদ-সালাত-ইন্শালাহ, লিখছি বাংলায় তরু খুতবা হিসাবে দু’একটি আয়াতাংশ এবং আরবী প্রবাদের উলেখ করছি ভূমিকা হিসাবে। অছিলা এবং জিহাদের প্রকারভেদ আছে ঠিকই। আমার ব্যক্তি জীবনে কোন্ অছিলা বা কোন জেহাদের মাধ্যমে আমি মরহুম পীর সাব কেবলার সান্নিধ্যে আসলাম তাঁর সূত্র ব্যক্ত করছি মাত্র।

১৯৪৩/৪৪ইং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধেও সময় চুনতী গ্রামে এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় আজমগড়ী তরীকার পীর মশায়েখ ডজনের কম ছিলনা ,তখন মরহুম পীর সাব কেবলার বয়স ও ২২/২৩ হবে। শাহ মাওলানা আবদুছালাম আরকানী (রাঃ) এর সাথে ইতিপূর্বেই তিনি তাছাউফের সোহবত লাভ করেছিলেন । বলা যায়, অত্র গ্রামের পুটি বিলা নিবাসী মরহুম শাহ হাফেজ অজীহুলাহ হযরত আজমগড়ী (রাঃ) এর খলীফা ছিলেন। তিনি আমার শৈশব বয়সে তাঁর শশুর বাড়ী মুন্সীপাড়া তশরীফ এনেছিলেন। এ বাড়ী হযরত আজমগড়ী (রাঃ) এর আর এক বিশিষ্ট খলীফা শাহ মাওলানা ফজলুল হক সাবের বাড়ী (অধমের শশুরের নানা)। আমার আম্মাজান তাঁদের কাছে আমাকে দুয়ার জন্য নিয়েছিলেন মনে পড়ে। আমার বয়স অনুমানিক ৪/৫ বৎসর হতে পারে।

চুনতী হাকিজিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় আমার ছাত্র জীবনে একবার হযরত আরকানী (রাঃ) তশরীফ এনেছিলেন। বর্তমান অফিস কক্ষ তখন মাটিয়া দেওয়ালের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ঘর ছিল। সম্ভবত ইতিপূর্বে আমাদের পীর সাব কেবলা এবং ওস্তাদ মরহুম শাহ মাওলানা শফিক আহমদ সাব হযরত আরকানী (রাঃ) থেকে খেলাফত লাভ করেছিলেন। সাথে আরও খলীফাবৃন্দ থাকতে পারেন। পীর মুর্শিদ কিংবা তরীকত সম্পর্কে তখন আমার কোন ধারণা ছিলনা। উপরোক্ত ঘরে সম্ভবত বাদে মাগরিব তরীকতের বৈঠক বসেছিল, ওস্তাদ মরহুম মাওলানা শফিক আহমদ সাব আমরা ক’জন ছাত্রকে অনুপ্রানিত করে ঐ মোবারক বৈঠকে বাসিয়ে দিয়েছিলেন। তরীকতের অজিফা যিকর শেষে আমাদের কয়েকজনকে উর্দুতে ছাপানো মুজাদ্দেদীয়া তরীকার অজীফা নামা হাতে দিয়ে বললেন, “তোরা ছাত্র ,বরকতের জন্য অজীফাগুলো আদায় করবি”। সেই অজীফানামা, আজ ও আমার হাতে সংরক্ষিত আছে। ১৯৬৮ইং চট্টগ্রাম মেডিকেল

কলেজের উত্তর পাশে নীচের এক কেবিনে অসুস্থ আরকানী (রাঃ) এর চিকিৎসা চলছিল। আমি তখন শহরে ছোট্ট একটা চাকুরীতে যোগদান করি। তাঁর ভক্ত বৃন্দ এর মুরীদানদের সাথে একবার দেখতে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। ঐ বৎসরই শেষবার চট্টগ্রাম সফর শেষে নিজ দেশবাড়ী আরকান ফিরে ইন্‌তিকাল করেন। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, আজমগড়ী আরকানী তরীকার দীক্ষা নেব।

১৯৭৫ সালে আমি তখন চট্টগ্রামে নাসিরাবাদ সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকুরীতে কর্মরত ছিলাম। স্কুল বন্ধ থাকলে কিংবা সাপ্তাহিক বন্ধে বাড়ীতে আসা যাওয়া করি। একদিন ছাত্র জীবনের পরম বন্ধু মাওলানা আনছারুল আজীম খান এবং প্রিয় ভাই হাজী মহিউদ্দীন ছিদ্দিকী বড় মাওলানা বাড়ী হযরত আজমগড়ী (রাঃ) এর অন্যতম খলীফা, পীর সাব কেবলার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর এবং মামা শাহ মাওলানা হাকীম মুনীর আহমদ রাঃ (ইউছুফ মঞ্জিল) এর নিকট তরীকার দাখেলা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। তারা দু'জন ইতিপূর্বে সবক চালু করেছিলেন।

অতঃপর হাকীম সাব নানাকে একদিন সুযোগ পেয়ে জামে মসজিদে জুমা শেষে দাখেলার আগ্রহ এবং অনুরোধ জানাই। তিনি বললেন, ও ভাই, একটি অজীফা নামার কাগজ আছে (সেই ছাত্র জীবনে প্রাপ্ত অজীফা নামা)। বললাম, নানা, আমার কাছে একটা আছে। সম্ভবত সেদিন ছিল ৭/৮/৭৫ সাল। তাঁর পরামর্শমত ইউছুপ মঞ্জিলের খানকাহ সম, পারিবারিক মসজিদে বাদে আছর দাখেলা নিয়ে ১ম কলব লতীফার সবক গ্রহণ করি। দু'এক বছর যথাসাধ্য অজীফাগুলি আদায় করতে থাকি। নানা হাকীম সাব বার্ধক্য জনিত দুর্বলতায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি বাড়ীতে যখনই আসতাম তাঁকে দেখতে যেতাম। দেখলে কতযে আদর করে ডাকতেন এবং পাশে বসতে বলতেন। নানীকে ডেকে আনার ডাক নাম ধরে বসাতে বলতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দুর্বলতার কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন আর আমি পেটের আলসার রোগে আক্রান্ত হই। ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হই। নানাকে দুয়ার জন্য সংবাদ পাঠাই, আম্মাজান তাঁর থেকে আমার জন্য "পানি পড়া" পাঠান। তৎকালীন সার্জন ডঃ করীম সাব আমার অস্ত্রোপাচারের পরামর্শ দেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ঔষধ পত্রের ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রথমবার হাসপাতাল ত্যাগ করলাম। ছয় মাসের মত একটু সুস্থবোধ করলেও পুনরায় ১৯৭৮ সালে হাসপাতালে গিয়ে অস্ত্রোপাচারে বাধিত হলাম।

হাকীম সাব নানার প্রায়ই অন্তিমশয্যা। একদিন দেখতে গিয়ে তাঁর শিয়রে বসেছিলাম। ইউছুফ মঞ্জিলের পুরাতন বাড়ীর উত্তর কামরাগুলোতে মরহুম মাওলানা শফিক সাব হুজুর তাঁর ছোট ভাইদের নিয়ে থাকতেন। নানা বলেন, রানীর বাপ থেকে (শফীক হুজুরের বড় মেয়ের নামে ডাক নাম) কুলসুমের বাপ (আমাদের মরহুম সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাব) এবং সবশেষে আমাদের পীর সাব কেবলার নাম নিয়ে ইঙ্গিত করলেন, সবক নিতে পারবে।

মরহুম পীর সাব কেবলার প্রতি পূর্ব থেকেই আমার ভক্তি ছিলো। সম্ভবত আমার ছাত্র জীবনে ১৯৬০ইং তিনি আলেম জমাতে আমাদের মিশকাত শরীফের দরস দিতেন। আমার মরহুম আব্বা ও কোন একসময় হুজুর কেবলা থেকে তরীকতের সবক নিয়েছিলেন। প্রমাণস্বরূপ আব্বার তেলাওতের কুরআনের অভ্যন্তরে হুজুরের স্বহস্তে লেখা অজীফার কাগজ পাওয়া যায় (সংরক্ষিত)। কাজেই আমার প্রথম মুর্শিদ নানা হাকীম সাবের জবানীতে হুজুর কেবলার নাম শুনে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। নানার কাছে পরবর্তী সবক পরিবর্তনের আর সুযোগ হয় নাই। তিনি ১৯৮১ সালে ৮৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। চুনতীর বাইরে আরকানে ও তাঁর মুরীদান ছিল। অত্র এলাকায় পুরুষ মহিলা বিস্তর মুরীদান পরবর্তী কালে আমাদের হুজুর কেবলার নিকট থেকে সবক গ্রহণ করতে থাকতেন। ১৯৮৪ সালে আমার আম্মাজান রক্তচাপ জনিত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। অনুমানিক তিন মাস পর তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের অল্প কিছুদিন পূর্বে পীর সাব কেবলার নিকট স্বজ্ঞানে তওবা পাঠ করেন।

সেদিনই মরহুম হাকীম সাব নানার সর্বশেষ ইঙ্গিতের কথা উলেখ করে তাঁর হাতে বয়াত করে তরীকতে দাখেলার আগ্রহ প্রকাশ করি। তখন হুজুর কেবলা আদরের সূরে বললেন, তা হলে আগামী কাল আমার মসজিদে হাজির হবে। ৩/২/৮৪ সাল জুমার দিন বাদে মাগরিব হাজির হয়ে হুজুরের কাছে সবক গ্রহণ আরম্ভ করি। তখন থেকে চাকুরী জীবনে যখনই বাড়ীতে আসি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতাম তাঁর মসজিদে হাজির হই। পেছনে বসে সোহবতে থাকার চেষ্টা করি। আমার কয়েকজন স্থানীয় তরীকত পন্থী মুরব্বী, মরহুম মাষ্টার ওবেদুল হাকীম (আহম্মদ মাষ্টার) মরহুম মাওলানা শাহরেয়ার, বড় মাওলানা বাড়ীর আলহাজ্ব মাওলানা সাইফুদ্দিন সিদ্দীকি প্রমুখ এ পথে আমাকে আন্তরিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। আলাহ পাক তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে অনুগৃহীত করুন, আমীন। আমি ছুটিতে বাড়ীতে পৌঁছলেই মরহুম চাচা আহমদ মাষ্টার সাব মাগরিবের সময় তাঁর সাথে পীর সাব কেবলার মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং আমাকে সবক বদলিয়ে দেওয়ার জন্য হুজুর কেবলার কাছে সুপারিশ করতেন। এতে আমার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুরীদানদের মধ্যে যাদের আগ্রহ দেখতেন। পীর সাব কেবলা আদর করে ডেকে সবক বদলিয়ে দিতেন। পূর্ব থেকেই তাছাউফের উর্দু-বাংলা বই পুস্তক আমার চোখে পড়লে কিনে স্কুল-রুটিনের ফাঁকে ফাঁকে পড়তাম।

আমি ১৯৭২ইং সালে কক্সবাজার থেকে বদলি হওয়ার বিদায়কালে শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ থেকে যে একটি স্মৃতি উপহার দেওয়া হয় তা ছিল হযরত মুজাদ্দেদ আল্‌ফে সানী (রাঃ) এর মককতুবাত সহ একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। তাছাউফ জীবনে এটাই ছিল আমার প্রথম হাতে খড়ি। এর পর আন্দরকিল্লাহ থেকে আলফে সানী (রাঃ) এর তদন্তের মকতুবাত শরীফ দাতা গঞ্জ বখশ (রাঃ) এর কাশফুল মাহজুব, ওমর সোহরাওয়ার্দী (রাঃ) এর আওয়ারেফ এবং আবদুল হক দেহলভী এর আখবারুল আখয়ার এবং বড় পীর জীলানী (রাঃ) এর আর ফুয়ূজে এয়াজদানী সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করি। এসব কিতাবাদী যাঁদের নজরে পড়েনি তাঁরাই তাছাউফ তরীকত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। ধৈর্য্যের সাথে একটি কিতাবই যদি তাঁরা পড়তেন তাহলেই তরীকত অনুসরেণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারতেন।

মরহুম পীর সাব কেবলা মাঝে মধ্যে সাপ্তাহিক বৈঠকে কিংবা তাঁর সাথে উঠা বসা এবং চলাফেরায় তাযকেরাতুল আউলিয়ার মাধ্যমে আমাদের নসীহত করতেন। তিনি প্রায়ই আজমগড়ী (রাঃ) এর কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুল হক, চুনতী হযরত হাফেজ অজীহুলস্নাহ পুটি বিলা এবং তদীয় মুর্শিদ হযরত আরকানী (রাঃ) এর কারামত এবং মর্তবার ঘটনা আমাদের শোনাতেন।
ইসলামী জীবনে হালাল রুজী রোজগারে সংসার জীবন যাপন অপরিহার্য। দেশের সরকারী রীতিনীতির বাস্তাবায়ন পূর্ণ ইসলামী নয় বিধায় যে কোন বিভাগের চাকরী জীবন নিষ্কলুষ নয়। এতদসত্বে পারিবারিক দায়ে রোজগারের উপায় একটা সকলকে করে নিতে হয়। তাই আলাহর দরবারে সর্বদা নিজেকে মনে করে তরবা এস্তে-গফারে জীবন কাটাতে হয়। কাজেই যথাসাধ্য তাকওয়া অর্জন করা বান্দার কর্তব্য।

শরীআত পালনের সাথে সাথে তরীকত চর্চা তাকওয়া অর্জনের মোক্ষম হাতিয়ার। আল্লাহওয়ালা কোন সিদ্ধ ব্যক্তির নিকট তওবা করে ওয়াদাবন্দী হয়ে তরীকত চর্চা আরম্ভ করলে পাপ কাজ ত্যাগের পথ সুগম হয়। প্রকৃত হেদায়ত আলাহ পাকের হাতে। সৎ কথা, সৎ কাজ এবং সৎ চিন্তায় আলাহর রাহমত শামেল হাল হয়। কথায় বলে, “দুনিয়ার উন্নতি আছায়েলে, ফজায়েলে নয়”। কিন্তু পরকালের উন্নতি কিংবা সাফল্যে ও অছায়েল প্রয়োজন।
মরহুম পীর সাব কেবলার সাথে অধমের আধ্যাত্মিক সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্যই উপরিলিল্লখিত অছায়েল বা মাধ্যম গুলোর অবতারণা। একেই তরীকতের পরিভাষায় “শজরায়েতাইয়েবা” বা “মিলসিলাতুয় যাহাব” বলা হয়। সুপ্রসিদ্ধ চারতরীকার কথা বা শজরা সর্বজনবিদিত।

২০০৩ সালে এল, পি,আর, সহ আমার চাকুরী জীবন সমাপ্ত হয়। তার ২/৩ বৎসর পূর্ব থেকেই বিভিন্ন এলাকায় তরীকত কর্মসূচীতে এবং মাদ্রাসার বার্ষিক সভার অনুষ্ঠানে পীর সাব কেবলা আমাকে সংগে নিয়ে যেতেন। হুজুর কেবলা তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে বিগত ২ বৎসর থেকে চুনতীর বাইরের সফর বন্ধ করে দেন। আমি তাঁর এজাযতক্রমে ঐসব এলাকায় গিয়ে তাঁরই অনুসৃত রীতি এবং তালীম তরবিয়ত অনুসারে তরীকত কর্মসূচী সম্পন্ন করে এসে রিপোর্ট দিতাম। তিনি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং উৎসাহিত করতেন যে, “মুরীদান স্বল্প সংখ্যক হলেও যারা আগ্রহ দেখায় তাদের কাছে যাবে”।

হুজুরের জীবদ্ধশায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর কোন মুরীদকে সবক দিতে সাহস পেতাম না। সরাসরি তাঁর কাছে যেতে পরামর্শ দিতাম। ওকাত পূর্ব দিন গুলোতে, যখন থেকে বাড়ীর বাইরে মসজিদে যেতে অক্ষম হয়েছিলেন তিনি সবক দেওয়া বন্ধ করে দেন। বহিরাগত কয়েকজন এবং স্থানীয় কয়েকজনকে তারই ইঙ্গিতে সবক প্রদানের দায়িত্ব পালন করি। হুজুর কেবলা তরীকত প্রচারে যে সব এলাকায় যেতেন বর্তমানের তুলনায় পূর্বকালের যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর এবং দুর্গম ছিল। তাঁর জবানীতে শুনেছি, ঐসব এলাকায় তিনি পায়ে হেঁটে কাঁধে প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড়ের একটি থলে নিয়ে সফর করতেন। ঐসব ব্যাপার চিন্তা করলে হকবাক হতে হয়।

সল্‌ফুযাত এবং কামালাতে আশরাফীয়ার মতে পীর মুর্শিদেরর তিনটি হক- এতেকাদ, এতেমাদ এবং এনকেয়াদ। স্বীয় হক্কানী মুর্শিদের প্রতি আমলী শরীআতি বিশ্বাস, শরীআত ভিত্তিক তরীকত চর্চার উপর আত্মবিশ্বাস এর মুর্শিদের কাছে নিজেকে দীনহীনভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারলেই তরীকত জীবনে সাফল্য লাভ হয়। শরীআতের পূর্ণ অনুসরণকারী পীরই শেখে কামেল। আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো লাখো শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে একজন হককামী আলেম এবং রব্বানী (আলফে সামীর তরীকা) পীর মুর্শিদের অছিলায় হেদায়ত করেছেন। তাই কোন এক অলি আলাহর ফার্সী বানীতে এতেকাদ, এতেমাদ এবং এনকেয়াদের ঘোষণা দিচ্ছিঃ-

খাতেমুল আম্বীয়া, সাইয়েদুল মুরসালীন, রাহমতুল লিল-আলমীন স্বীয় সত্তাকে বিলীন করে মাবুদের কাছে হিসাবে আত্মসর্মপণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরই উম্মতের মধ্যে আখেরী যুগের মুজাদ্দেদীয়া নক্‌শবন্দীয়া তরীকতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদের হুজুর কেবলার মুর্শিদে বরহক হযরত শাহ মাওলানা আবদুছ্‌ছালাম আরকানী (রাঃ) তরীকতের অজীফা নামায় “ফকীর আবদুছ্‌ছালাম” লিখিয়ে ছিলেন। আমাদের পীর সাব কেবলাও তদীয় মুর্শিদের প্রতি পূর্ণ এতেকাদ এবং আত্মসমর্পণের প্রমাণ স্বরূপ হয়তো নিজের পরিচয় গোপন রেখে অজীফা নামায় বরকতের জন্য আরকানী (রাঃ) এর নাম বহাল রাখেন।

তাছাউফের কিতাবাদীতে দেখতে পাই। তরীকতের পথে কারামতের চেয়ে এর (নেকআমলে দৃঢ়তা) গুরুত্ব অধিক। সুলুকের পথে কাশ্‌ফ কারামতকে আলফে সানী (রাঃ) এর মকতুবাতে ছোট শিশুদের মনক্কা দিয়ে সন্তুষ্ট করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা যারা মরহুম পীর সাব কেবলার তরীকত সূত্রে আবদ্ধ আছি, আলস্নাহর সাহায্য প্রার্থী হয়ে সবক বদলিয়ে সাধ্যমত কাজে অগ্রসর হওয়াতেই হুজুর কেবলার আত্মিক শান্তির দৃঢ় আশা পোষণ করি। অলসতা কুফরানে নেমত।

মরহুম পীর সাবকেবলার পরশে সৌভাগ্যের আর এক ধাপঃ-

পীর সাব কেবলা তাঁর মুরীদানদের মধ্যে যাদের একটু কাছে তরীকতের কাজে আগ্রহী দেখতেন তাদেরকে আদরের সূরে ডেকে সবক দিতেন। ইউছুপ মঞ্জিলের মাওলানা নাজেম ভাই সর্বদা বাড়ীতে থাকতেন। আমি থাকতাম চট্টগ্রাম শহরে চাকুরীরত। ফলস্রুতিতে তিনি আমার আগেই মুজাদ্দেদীয়ার সবক শেষ করে কাদেরীয়া আরম্ভ করে ফেলেন আর মুজাদ্দেদীয়া তরীকার শেষ কয়েক সবক বাকী থাকতেই পীর সাব কেবলা আমরা দু'জনকে ১৯৯৮ সালে বার্ষিক সম্মেলনে বড় মাওলানা বাড়ীর দাদা হাজী সাইফুদ্দিন সিদ্দীকির মাধ্যমে এজাযত প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

অতঃপর ২০০০ সালে আমার বড় ভাই মাওলানা আমীন সাহেবের বাগান পাড়ার বাড়ীতে এক খত্মে কুরআনের দাওয়াতে পীর সাব কেবলা বললেন, "তরীকতের কাছে অগ্রগতি হাছিলের জন্য বড় পীর জিলানী (রাঃ) এর কাদেরীয়া তরীকার সবক নিতে হবে"। শুভ দিনটি ছিল জুমাবার ২২/৯/২০০০ সাল, 'কলব' লতীফা থেকে সবক প্রদান আরম্ভ করে দিলেন। দুই তরীকার সবকগুলিতে তিনটি লতীফার স্থান ব্যতীত অন্য সবগুলোর নাম এবং স্থান প্রায়ই এক। তাই হুজুর কেবলা একই বৈঠকে কয়েকটি লতীফার সবক দিয়ে আগাইয়া নিলেন। সাথে সাথে কাদেরীয়া তরীকার যিক্‌রে জলীর পদ্ধতি ও বাতলিয়ে দিলেন। অনুমানিক বছর দেড়েক এর মধ্যে মুজাদ্দেদীয়া তরীকার মত যতগুলো সবক প্রয়োজন হুজুর কেবলা কাদেরীয়া তরীকার সবকগুলো ও একের পর এক করে সমাপ্ত করে দেন।

আমাদের পীর ভাই গণের এবং এজাযত প্রাপ্ত বাকী ৪ জনের মধ্যে সবক গ্রহণ করার দিন তারিখ আর পূর্ণ মেয়াদকাল ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আমি প্রায়ই সাপ্তাহিক বৈঠক বৃহস্পতিবার সবক নিতাম। সুযোগ পেলে বন্ধের সময় অন্যান্য দিনেও সবক নিতাম। সুতরাং যিনি যখনই সময় পেতেন সবক নিয়ে যেতেন।

রাহমানুর রহীম গফুরুররহীম আলাহ পাকের রাহমত শামিল হাল ছিল। পীর সাব কেবলার পিতৃসুলভ দুয়া, ফয়েজ বরকতে এবং আমার মেজো ভাইরা বনফুলের (ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) অন্যতম শেয়ার হোল্ডার জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ হোসনের ভ্রাতৃসুলভ আন্তরিকতা ও উৎসাহে বিগত ২০০৪ সালে চট্টগ্রামস্থ হক হজ্জ্ব কাফেলার মাধ্যমে আমার পবিত্র ফরজ হজ্জ্ব ব্রত পালন করার সৌভাগ্য নছীব হয়। আমার এযাবৎ জীবন কালের আশৈশব, ছাত্রজীবন এবং কর্মজীবনের নানা সঙ্কট কাটিয়ে পারিবারিক জীবনের মরহুম পীর সাব কেবলার ওফাত নাগাদ, যতটুকু সাফল্য লাভ হয় সবগুলোর সূত্র মুজাদ্দেদীয়া নক্‌শবন্দীয়া আজমগড়ী আরকানী তরীকার ফয়েজ বরকত বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। যেহেতু এ তরীকা সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীআত ভিত্তিক বলে পরিক্ষিত এবং প্রমাণিত। তাই ইমামুত তরীকত হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রাঃ) স্বীয় মকতুবাত শরীফে কিয়ামতের পূর্বে হযরত ইমাম মেহেদী (আঃ) এর আগমন এ তরীকার কামালিয়তে হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। আলাহ পাক্ অধমকে ঈমান এবং নেক আমলের দৃঢ়তা দান করুন! আমীন।

পীর সাব কেবলার ওফাতের পর ঃ-

(ক) ৭/১২/০৬ইং বৃহস্পতিবার (ওফাতে পর ২য় বৃহস্পতি) কারী মাওলানা জালালুদ্দীন মুনীরি রেওয়াত করেন। পীর সাব কেবলার ওয়াতের দিন সকালে সাতগড় নিবাসী এক ব্যক্তি পাহাড়ের দিকে কাজকর্মে যাচ্ছিল (ঐ ব্যক্তির কাছে তখনো হুজুর কেবলার ওফাতের খবর পোঁছেনি) কর্মস্থলের কাছাকাছি পোঁছলে দেখতে পায় মরহুম শাহ সাব কেবলা এবং পীর সাব কেবলা (জীবিত শরীরে) দক্ষিণ দিকে চলছেন। লোকটি শাহ সাব কেবলাকে মামু সম্ভোধন করে কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তরদেন। "হাবীব (হুজুর কেবলা) চলে এসেছে, আমরা আরকানী সাবের কাছে যাচ্ছি"। সুবহানালাহ। ঐ ব্যক্তি কাজে নাগিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসে পীর সাব কেবলার ওফাতের সংবাদ মাইকের ঘোষনায় শুনতে পায়। সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে নিজের নাম গোপন রাখার শর্তে প্রকাশ করে বলে জানা যায়।

(খ) ১১/১২/০৬ইং সোমবার দিবাগত রাত জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ মঈনু স্বপ্নে হুজুর কেবলাকে দেখেন। বাদে জুমা প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি কুরআন তেলাওত করছেন এবং অনেকে তাঁর পেছনে বসেছি। দ্বিতীয় বার দেখতে পায়, বার্ষিক তরীকত সম্মেলনে খানা পরিবেশন করার সময় তিনি যেভাবে ভান্ডার খানায় মেহমানদের তদারকী করতেন তদ্রুপ গলীর মাঝে পায়চারী করছেন।

(গ) ১৪/১২/০৬ইং বৃহস্পতিবার। সাপ্তাহিক বৈঠকে যথারিতী হাজির হই। পীর ভাই মাওলানা নাজেমের কাছে দু'জন মুরীদ সবক আদান প্রদান করে। বাদে এশা উপস্থিত সকলে মিলে জেয়ারত করে আমি।

রহমানিয়া পাড়ার জকরিয়া নামক ব্যক্তি পীর সাব কেবলার নাজুক অবস্থার আগে তার অসুস্থতার আরোগ্যের জন্য তাঁর খেদমতে ঝাড়ফুক এবং পানিপড়ার জন্য কয়েকবার যায়। ফলে সে অনেকটা সুফল পায় বলে জানায়। সে গতরাত দেখতে পায় (স্বপ্নে) মরহুম পীর সাবকেবলা সুস্থ শরীরে দক্ষিণের পথে যাত্রা দিয়েছেন।

উলেখিত ২টি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় মরহুম হুজুর কেবলা এবং তদীয় মুর্শিদ হযরত আরকানী (রাঃ) এর মধ্যে খাদ রূহানী সম্পর্ক ছিল বলে আমার ধারণা। আলাহ্ পাকই সঠিক অবগত আছেন।

(ঘ) আমার ভাইপো মীজানু পীর সাব কেবলা মরহুমের অন্যতম মুরীদ স্বপ্নে জামে মসজিদ পাহাড়ের নিকট হযরত আরকানী (রাঃ) এর মত এক ব্যক্তিত্বের সাথে মোলাকাত করে বলে জানায়। সে তাঁকে কিছু টাকা হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করে স্পষ্ঠ আকার অবয়ব মনে রাখতে না পারলে ও সে তাঁকে আরকানী(রাঃ) ধারণা করে সম্মান করে।

(ঙ) জামে মসজিদের মুয়াজিন হাফেজ মঈনুর অপর এক রাতের স্বপ্ন মরহুম হুজুর কেবলা হাকিমিয়া মাদ্রাসার অফিস কক্ষে বসে নতুন ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তি ফরমে স্বাক্ষর দিচ্ছেন। অধ্যক্ষের মত ছাত্রদের কিছু প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করছেন এবং বলছেন যারা উত্তর দিতে পারছেনা দুর্বল তাদের ভর্তি করানো হবে। হুজুর কেবলা প্রায়ই মাদ্রাসার ছাত্রদের লেখাপড়ার মানউন্নয়ন পদ্ধতির কথা বলতেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে মাদ্রাসাটি পরিচালিত হওয়াটাই অভিষ্ঠ লক্ষ্য ছিল এবং তাই তিনি জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত মাদ্রাসার কল্যাণে আপোষহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

সংগ্রহে ও রচনায়
মোঃ ওবাইদুর রহমান (মৌং আবেদ) মুন্সেফ বাজার, চুনতী
ডিসেম্বর প্রথমপক্ষ, ২০০৬ ইংরেজী।
ফোন ঃ ৮৮০১৫৮-৩০৭৩১৩।